Visit Our Website : natunchithi.co.in

# নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৩

৪৬ বর্ষ ৪৮ সংখ্যা ১৮ ডিসেম্বর, ২০২৩, সোমবার, ১ পৌষ, ১৪৩০

## নিরুপম সেন স্মারক বক্তৃতা

নিরুপম সেন স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৯ ডিসেম্বর বেলা ২.৩০ মিনিটে সংস্কৃতি লোকমঞ্চে। বক্তা ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও সিপিআই(এম) পলিট ব্যুরো সদস্য মানিক সরকার।


# আবার আসছে দুয়ারে সরকার

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সফলতম এবং জাতীয় স্তরে সমাদৃত ও
রাজ্যের সর্বাধিক মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা প্রদানের অনন্য কর্মসূচি

এ পর্যন্ত

| পর্যায় | শিবির | পরিষেবা |
|---|---|---|
| ৭টা | ৫.৬৬ লক্ষ | ৮.১০ কোটি |

দুয়ারে সরকার

এবারও বুথে বুথে

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী
**মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের**
ঐকান্তিক উদ্যোগে

## ৩৬টি পরিষেবা নিয়ে

১৫ ডিসেম্বর, ২০২৩ থেকে
পুনরায় শুরু হচ্ছে

# ‘দুয়ারে সরকার’

(অষ্টম পর্যায়)

আবেদনপত্র গ্রহণ শিবির
১৫-৩০ ডিসেম্বর, ২০২৩

পরিষেবা প্রদান শিবির
২-৩১ জানুয়ারি, ২০২৪

**৮ম পর্যায়ের পরিষেবা:**

- লক্ষ্মীর ভাণ্ডার
- ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড
- খাদ্য সাথী
- স্বাস্থ্য সাথী
- প্রতিবন্ধকতার শংসাপত্র
- কাস্ট সার্টিফিকেট
- তপশিলি বন্ধু
- মেধাশ্রী
- শিক্ষাশ্রী
- জয় জোহার
- কন্যাশ্রী
- রূপশ্রী
- মানবিক
- বিধবা ভাতা
- কৃষকবন্ধু
- কিষান ক্রেডিট কার্ড (কৃষি)
- কৃষি পরিকাঠামো তহবিল – প্রতিটি আবেদন পৃথকভাবে গ্রহণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং অনুমোদন প্রদান
- কিষান ক্রেডিট কার্ড (প্রাণীপালন)
- বাংলা কৃষি সেচ যোজনার আওতায় আবেদন গ্রহণ এবং আর্থিক সহায়তার অনুমোদন প্রদান
- ঐক্যশ্রী
- স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড
- মৎস্যজীবী নিবন্ধীকরণ
- স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ঋণ প্রদান
- আহার পরিষেবা সংক্রান্ত সহায়তা
- ব্যাঙ্কিং পরিষেবা সংক্রান্ত সহায়তা
- কৃষিজমির মিউটেশন
- পাট্টার জন্য আবেদন
- বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা
- মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ড
- বকেয়া বিদ্যুৎ বিলের আংশিক মকুব
- বিদ্যুৎ–এর নতুন সংযোগ
- বার্ধক্য ভাতা
- পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্পের নিবন্ধীকরণ
- হস্তশিল্পী ও তাঁতশিল্পীর অনলাইন রেজিস্ট্রেশন
- ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগীদের উদ্যম পোর্টালের অনলাইন নিবন্ধীকরণ
- উদ্যানজাত ফসলের সুরক্ষিত চাষের জন্য আবেদনপত্র গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণ

‘দুয়ারে সরকার’ শিবিরে সকল পরিষেবার ফর্ম **বিনামূল্যে** পাওয়া যাবে।
ক্যাম্প থেকে প্রাপ্ত ফর্ম ছাড়া কোনও ফর্ম গৃহীত হবে না।
পরিষেবার জন্য নিজেরা ক্যাম্পে আসুন।

আপনার সহায়তার জন্য নিকটতম বাংলা সহায়তা কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন।

আপনার নিকটবর্তী ক্যাম্প কোথায় এবং কবে হবে জানতে ক্লিক করুন: https://ds.wb.gov.in

০৩৩ ২২১৪ ০১৫২
১৮০০ ৩৪৫ ০১১৭

পাড়ায় সমাধান
পাড়ার প্রয়োজনে, পাড়ার পাশে

এলাকার জরুরি সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধান
স্থানীয় স্তরে পরিকাঠামোগত শূন্যতা পূরণ ও পরিষেবার ঘাটতি চিহ্নিতকরণ ও পরবর্তীতে তার আশু সমাধান।

পাড়ায় সমাধান–এর আবেদন নেওয়া হবে
১৫–৩০ ডিসেম্বর, ২০২৩

সকল সরকারি পরিষেবা বিনামূল্যে পেতে ‘বাংলা সহায়তা কেন্দ্র’–এ যোগাযোগ করুন অথবা লগ অন করুন www.bsk.wb.gov.in-এ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার | আপনার পাশে, আপনার সাথে

@egiye_bangla

R.O. Number 334(4)/ICA/PUB/BDN(ADVT) Date : 16.12.2023

# নতুন চিঠি

১৮ ডিসেম্বর, ২০২৩


## কৃষকের দুর্দশা

স্বাধীনতার পর দেশের অর্থনীতিতে রক্তসঞ্চার করতে 'জয় কিষাণ' আওয়াজ তোলা হয়েছিল। শিল্প তখন বহু কোটি বিনিয়োগের ব্যাপার, বড় শিল্পে বিনিয়োগের ক্ষমতাসম্পন্ন শিল্পপতি ছিল হাতে গোনা। কৃষিতে উৎপাদন বাড়লে কৃষকের অবস্থা ফেরে, দেশের অর্থনীতি মজবুত হয়। তাই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষিকেন্দ্রিক নীতি, সবুজ বিপ্লব, উন্নত বীজ ও সার ব্যবহারে জোর, সেচ ব্যবস্থার উন্নতি। কৃষিকেন্দ্রিক রাজনীতিও, যেমন পারিবারিক জমির উর্ধসীমা কত হবে, কৃষিকাজে নিযুক্ত খেতমজুরের ন্যূনতম মজুরি কত হবে ইত্যাদি প্রশ্নকে উপেক্ষা করতে পারেনি তখনকার নীতিপ্রণেতারা। তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে। শিল্প এসেছে দেশের আর্থিক পরিকল্পনার কেন্দ্রে, শিল্পপতির কদর বেড়েছে, কৃষক হয়েছে ব্রাত্য।

এমনটা মনে হবার অনেক কারণ আছে। সাম্প্রতিক যে ঘূর্ণিঝড় তামিলনাড়ু- অন্ধ্রপ্রদেশে ব্যাপক তাণ্ডব চালিয়েছে, এ রাজ্যেও কিছুটা প্রভাব ফেলেছে। দুদিনের বৃষ্টিতে মাঠে জল জমেছে, এমন এক সময়ে যখন অধিকাংশ জমিতে পাকা ধান হয় কেটে রাখা অথবা কাটার অপেক্ষায়। যে জমিতে ধান উঠে গেছে সেখানে সদ্য আলু পাতা হয়েছে। এমত অবস্থায় অকাল বৃষ্টি আক্ষরিক অর্থে 'পাকা ধানে মই' দেওয়ার সামিল। বিঘার পর বিঘা ধান নষ্ট হয়েছে, আলুক্ষেতে আলুবীজ পচে গেছে, সর্বস্ব বিকিয়ে চাষে বিনিয়োগ করা কৃষক পথে বসেছে, সর্বস্বান্ত কৃষক আত্মহত্যা করেছে, কিন্তু সরকারের হেলদোল নেই। দলবদল, রাজনীতিকদের আইনের সঙ্গে চোরপুলিশ খেলা আর টলিউডি কেচ্ছা নিয়ে মেতে থাকা সংবাদমাধ্যম কৃষকের এ দুর্দিনেও তাদের সর্বনাশের খবরকে জনসমক্ষে এনে গণবিবেককে জাগানোর সামাজিক দায়িত্ব পালনের কাজটুকু করছে না। অর্থাৎ কৃষকের 'দুরবস্থা' আজ আর খবর নয়।

অথচ কী কেন্দ্র সরকার, কী রাজ্য সরকার, ভোটের জন্য কৃষকদরদী ভেক ধরার বিরাম নেই। খয়রাতি রাজনীতির এ দুঃসময়ে সে দরদ বছরে ক'টাকা নগদ দেওয়া হবে সে প্রতিশ্রুতিতেই সীমাবদ্ধ। কৃষককে বাঁচাতে আগে সারে, কীটনাশক উৎপাদনে যে ভর্তুকি দেওয়া হতো, ভর্তুকি তুলে সে টাকা নগদে দেবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। তাও সবার ঘরে ঢুকছে না সেই নগদ সাহায্য। দুর্নীতির কথা আপাতত থাক। ভর্তুকিহীন ব্যবস্থায় একজন কৃষক দুহাজার টাকা বেশি দামে সার কিনে যদি দু হাজার টাকা পান, তাঁর আসল প্রাপ্তি যে শূন্য হয়। অথচ এটা সুকৌশলে চেপে প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী কৃষককে কত দিচ্ছেন সেই মিথ্যা কাহিনী শোনানো হচ্ছে। গোদের ওপর বিষফোঁড়া, ফসলের দাম নেই। ন্যূনতম সহায়কমূল্য সুনিশ্চিত করতে চায় না সরকার। ফড়েদের রমরমায় পেঁয়াজ উৎপন্ন করে যে কৃষিজীবী কিলোপ্রতি পাঁচটাকা পান, বাজারে সে পেঁয়াজ ষাট টাকায় বিক্রি হয়। এই অনাচার সরকারি ব্যর্থতা নয়, সচেতন প্রশ্রয়েই সম্ভব। কৃষিকে বাঁচাতে, কৃষককে বাঁচাতে রাজনীতির মোড় ঘোরাতেই হবে, কারণ এ দেশের ষাট ভাগ মানুষ এখনও কৃষিনির্ভর।

## মঙ্গল ও গোপা চৌধুরী নাট্য কেন্দ্রের, ব্যারিকেড, অংশুপত্র উপাখ্যান

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১১ ডিসেম্বর :** ৯ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় সংস্কৃতি লোকমঞ্চে উৎপল দত্ত রচিত, দেবেশ চট্টোপাধ্যায় নির্দেশিত, 'ব্যারিকেড' দেখে নাট্যপ্রেমিকরা অভিভূত। মঙ্গল ও গোপা চৌধুরী নাট্য কেন্দ্রের ২৯ তম বর্ষপূর্তিতে 'ব্যারিকেড' ও 'অংশুপত্র উপাখ্যান' বর্ধমানের মানুষ দুটি ভালো নাটক উপহার পেলেন। উৎপল দত্তর 'ব্যারিকেড' নাটকটি ১৯৩০ সালের জার্মানির নাৎসি বাহিনীর নেতা ফ্যাসিস্ট হিটলার কমিউনিস্টদের শেষ করতে যে পথ নিয়েছিলেন তার পটভূমিকায় লেখা। আজকে আমাদের দেশ ও রাজ্যের শাসক যে ভূমিকায় অবতীর্ণ তা থেকে কমিউনিস্টদের শিক্ষা নেওয়ার সময় এসেছে। শান্তিপুর সাংস্কৃতিক এর অংশুপট উপাখ্যান দর্শকদের মন জয় করেছে। সংস্থার কর্ণধার অরূপ চৌধুরী জানান ১৯৯৫, একটি সুন্দর সাঙ্গীতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে মঙ্গল চৌধুরী নাট্যচর্চা কেন্দ্রের সূত্রপাত হয় এবং নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, নাটকটাই ছিল মূল লক্ষ্য। সেই সময় বর্ধমানের সমস্ত জ্ঞানীগুণী মানুষ, সংস্কৃতি জগতের প্রায় প্রত্যেকেই এবং তৎকালীন বামমনস্ক সমস্ত মানুষ মঙ্গল চৌধুরী নাট্য চর্চা কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নাট্য ওয়ার্কশপ, স্থানীয় নাট্যসংস্থার নাটক—এই নিয়ে শুরু হলেও পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে কলকাতার বিশিষ্ট শিল্পীদের নিয়ে এসে নাটকের ওয়ার্কসপ, নাটকের ইতিহাস আলোচনা এবং তার সঙ্গে, নাটকের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এই সময় এই কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে এসে যোগদান করেছেন প্রখ্যাত অভিনেতা চন্দন সেন, প্রখ্যাত নির্দেশক বিভাস চক্রবর্তী, নাট্য রচয়িতা এবং অভিনেতা মনোজ মিত্র, অভিনেতা দেবেশ রায়চৌধুর, পার্থপ্রতিম দেব, সব্যসাচী চক্রবর্তী, শান্তিলাল মুখার্জী, চন্দন সেন, কৌশিক চট্টোপাধ্যায়, দেবশঙ্কর হালদার, মেঘনাদ ভট্টাচার্য ইত্যাদি। প্রতিবছর মঙ্গল ও গোপা চৌধুরী সংস্কৃতিচর্চা কেন্দ্র নাট্য পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে তার ধারা বজায় রেখে চলেছে। ব্যারিকেড নাটকের শেষে নির্দেশক ও অভিনেতাদের সংবর্ধিত করেন, 'নতুন চিঠি'-র সম্পাদক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য ও বর্ধমানের নাট্য অভিনেত্রী,বর্তমান বৃন্দাবনবাসী রাখী চ্যাটার্জী।

# সরকারের কর্পোরেট প্রীতি ও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সর্বনাশ

**দেবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়**

ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে ঋণগ্রহীতা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফেরত না দিলে তা সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের অনুৎপাদক সম্পদে (এন পি এ) পরিণত হয়। এই সম্পদ থেকে ব্যাঙ্কের কোন রিটার্ন বা আয় অর্জিত হয় না। এন পি এ-র কয়েকটি উদাহরণ হল—১) 'ডিফল্ট বন্ধকী'। ডিফল্ট বন্ধকী বলতে বোঝায়, বন্ধক রাখা সম্পত্তির ক্ষেত্রে ঋণখেলাপ। 'ডিফল্ট বন্ধকী' হল এন পি এ। ২) ক্রেডিট কার্ড মারফত ব্যাঙ্ক যে ঋণ দেয় তা যদি ফেরত না আসে তা। ৩) কর্পোরেট ক্ষেত্রের 'ব্যাড' ঋণ। কোম্পানিসমূহ তার উৎপাদিত পণ্য ক্রেতাকে ধারে বিক্রি করে ও ক্রেতা নির্দিষ্ট সময় অন্তর শর্তানুযায়ী তা পরিশোধ করে। ক্রেতা পরিশোধ করতে না পারলে ওই ঋণকে 'ব্যাড' বা মন্দ ঋণ বলে। ৪) কৃষিক্ষেত্রের অনুৎপাদক ঋণ। ভারতের ব্যাঙ্কসমূহে অনুৎপাদক সম্পদ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ হতমানের ঋণ পরিচালন ব্যবস্থা, সঙ্গে রয়েছে শিল্প মন্দা, অত্যন্ত নিম্নমানের পর্যবেক্ষণ বা মনিটারিং ব্যবস্থা। এখানে আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে ঋণ মকুব ও কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি ও সরকার-অনুসৃত কার্যকলাপের উপর।

মোদীর শাসনকালে শুধুমাত্র ২০১৪- ১৫ থেকে ২২-২৩ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত, বেসরকারি, বিদেশি ব্যাঙ্ক সমূহের বকেয়া ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬৭ লক্ষ কোটি টাকা। এর মধ্যে ১৪.৫ লক্ষ কোটি টাকা ব্যাঙ্কের খাতা থেকে মুছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে সরকার। এই পরিমাণের ৮০ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ১২ লক্ষ কোটি টাকা গেছে কর্পোরেটদের কোষাগারে। এটাকে কি কর্পোরেট ভর্তুকি বলা যায় না? মোদী সরকার সব সময় চায় অনুগত আমলা, অনুগত সব ধরনের প্রতিষ্ঠান। সেজন্য রঘুনাথ রাজন ও উর্জিত প্যাটেল গভর্নর থাকার সময়ে এন পি এ মুছে দেওয়ার কাজ করতে পারেননি। আমলা শক্তিকান্ত দাসকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর করার পর এই অসঙ্গত, ক্ষতিকর কাজটা করল। অথচ কর্পোরেটদের কোষাগারে যাওয়া ওই প্রায় ১২ লক্ষ কোটি টাকা দিয়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিকাঠামোর উন্নয়ন ঘটানো যেত। যার দীর্ঘমেয়াদী সুফল অর্থনীতি পেত। কিন্তু সরকারের দর্শন হল রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কব্যবস্থার ক্ষতির বিনিময়ে কর্পোরেটকে তুষ্ট ও পুষ্ট করা। জনসাধারণকে বোঝানো হল ব্যাঙ্কের অনাদায়ী ঋণ তারা কমিয়ে এনেছে। যা একেবারেই মিথ্যা ছাড়া কিছুই নয়। এছাড়া সরকার ব্যাঙ্কগুলোকে 'টেকনিক্যাল রাইট অফ' করার ক্ষমতা দিয়েছে। 'রাইট অফ'-এর অর্থ যে লোনকে ব্যাঙ্কের সম্পদ হিসেবে দেখাতে হয় না। এর ফলে ব্যাঙ্কের এন পি এ কমেও ব্যাঙ্ক বেশি মুনাফা অর্জন করছে এটা দেখানো যায়। ব্যাঙ্ক কর্মী ইউনিয়ন শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতির কাছে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি করেছে। এন পি এ মুছে দেওয়া ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এক বিপদজনক প্রক্রিয়া।

স্বজনপোষণ দেশে ও রাজ্যে ভয়ংকর রূপ নিয়েছে। গত বছর লাল কেল্লায় প্রধানমন্ত্রী 'স্বজনপোষণের' বিরুদ্ধে তীব্র জেহাদ ঘোষণা করেন ও তা নির্মূলের আহ্বান জানান। অথচ সরকার এন পি এ কমানোর জন্য ১৪.৫ লক্ষ কোটি টাকা মুছে দিয়েছে। সংসদে অর্থ প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছেন অর্থবছর ২১-২২-এ ঋণ মকুব করা হয়েছে ১.৫৭ লক্ষ কোটি টাকা। শুধুমাত্র এক বছরে কর্পোরেট 'স্বজনদের' জন্য ঋণ মকুব করা হয়েছে। এটা কি পোষণ নয়? অর্থ প্রতিমন্ত্রী মোদীর ভাষণের কয়েকদিন আগে যে তথ্য দিয়েছেন তা হলো ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ১.৬১ লক্ষ কোটি টাকা, ১৮-১৯এ ২.৩৬ লক্ষ কোটি টাকা, ১৯-২০ তে ২.৩৪ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ মকুব করা হয়েছে। আরও যে তথ্য পাওয়া গেছে তা হলো ২০২২ সালে ১৮৪০ জন ব্যবসায়ী ইচ্ছাকৃত ঋণ খেলাপ করেছে। জনসাধারণ কর দেয়। সেই করের একটা অংশ ব্যাঙ্কগুলোকে তাদের মূলধন হিসেবে সরকার দেয়। এই অর্থ যদি ব্যাঙ্কগুলো পরিকল্পিতভাবে নিয়োগ করার স্বাধীনতা পেত, তাহলে তা অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক হত। কিন্তু সরকারি নীতি ও নির্দেশের ফলে তা চলে যাচ্ছে 'স্বজনদের' কাছে। আরো হতাশাব্যঞ্জক দিক হলো সরকার যে পরিমাণ মূলধন ব্যাঙ্কগুলোকে দিয়েছে তার তিন গুণ দিয়েছে কর্পোরেটদের। এই অপচয় অর্থ ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাকে ভেঙে দিচ্ছে। এন পি এ কমায় আপাতভাবে ব্যাঙ্কের স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে মনে হতে পারে, কিন্তু তা প্রকৃত সত্য নয়। ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপীদের কাছে ব্যাঙ্কের বকেয়া পাওনার পরিমাণ ২০২২ সালে ছিল তিন লক্ষ কোটি টাকার কাছাকাছি।

অর্থনীতিবিদদের একটা বড় অংশ মনে করেন সরকারি প্রণোদনায় 'ইচ্ছাকৃত' ঋণখেলাপীরা দেশের অর্থ লুট করছে। এরা টাকা আত্মসাৎ করে পালাতেও পারে কারণ আইন তাদের নিরাপত্তা দিচ্ছে। তারা নিরাপদ। তাদের ঋণ মকুব করা হয়েছে এন পি এ কমানোর মাধ্যমে। এখন তারা খেলাপী হয়েও অর্থনৈতিক অপরাধী নয়। এই প্রক্রিয়ার কী ফল হয়েছে? বিজয় মালিয়া, নীরব মোদী, আরও কয়েকজন বিদেশে পালিয়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তথ্যানুযায়ী ঋণখেলাপী ৫০টি সংস্থা ৬৮ হাজার ৬০৭ কোটি টাকা ঋণখেলাপ করেছে। সরকারি নীতি নির্দেশের ফলেই ব্যাঙ্কগুলোকে ও অর্থনীতিকে তা খাদের কিনারায় নিয়ে যাচ্ছে। মেহুল চোকসীর সংস্থা 'গীতাঞ্জলি জেমস্ লিমিটেড'কে ঋণ ছাড় বা মকুব করা হয়েছে পাঁচ হাজার কোটি টাকা। এছাড়াও চোকসীর আরও দুটো সংস্থাকে ২৬০০ কোটি টাকার ঋণ মকুব করা হয়েছে। অথচ ২০১৬ সালে অনেক ঢাক ঢোল পিটিয়ে দেউলিয়া কোড ঘোষণা করা হয়। দাবি করা হয় এই কোড অনুযায়ী এক বছরের মধ্যে সব অনাদায়ী ঋণের মীমাংসা করা হবে। কিন্তু বাস্তবে দীর্ঘ সময়ের পরেও মাত্র ৩২ শতাংশের কম ঋণ আদায় হয়। বাকিটা মকুব করা হয়। যার অর্থ জনগণের উপর ওই বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এই কর্পোরেট ব্যবস্থাকে সঠিকভাবেই বলা হয়েছিল, লাভ হলে নিজের, লোকসান হলে সমাজের।

ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের সংস্কারের জন্য গঠিত নরসিমহা কমিটি নয়া আর্থিক নীতির জমানায় ১৯৯১ সালে এন পি এ সমস্যা মেটানোর জন্য বিকল্প প্রস্তাব দেয়। 'ন্যাশনাল অ্যাসেট রিকন্সট্রাকশন কর্পোরেশন' গঠনের প্রস্তাব দেয়। প্রস্তাবে বলা হয় নব গঠিত কর্পোরেশন ব্যাঙ্কের সমস্ত এন পি এ কিনে নেবে ও এজন্য ব্যাঙ্কগুলোকে বন্ড ইস্যু করবে। কিন্তু সরকারের সদিচ্ছা ও কর্পোরেট প্রীতির জন্য সংস্থা যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারেনি। ২০২৩ সালে এন পি এ কেনার জন্য ৫০০০০ টাকার সংস্থান থাকলেও ব্যয় হয়েছে কমবেশি ১০৪০০ কোটি টাকা। সাম্প্রতিক সময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটা সিদ্ধান্ত সরকারের কর্পোরেট প্রীতিকে আরও সামনে এনেছে। নির্দেশটি হলো ব্যাঙ্কগুলো ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপীদের সাথে সমঝোতা- মীমাংসা করে তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা বিপুল অর্থের অন্তত কিছুটা উদ্ধার করে নিতে পারবে। আরও বিপজ্জনক নির্দেশ হল খেলাপীর কিছুটা অর্থ উদ্ধার করা গেলে তাকে এক বছর পর ব্যাঙ্ক আবার ঋণ দিতে পারবে। এ তো ডবল ডিভিডেন্ড প্রাপ্তি। সরকারি ব্যাঙ্ক ধ্বংস করার জন্য এর থেকে বড় নির্দেশ আর কী হতে পারে? একদিকে কর্পোরেট জনগণের কষ্টার্জিত ব্যাঙ্কে সঞ্চিত অর্থ লুট করল, অন্যদিকে আগামীতে তাদের আরো ঋণ পাওয়ার পথ খোলা থাকল। প্রশ্ন উঠতে বাধ্য, জনসাধারণের সঞ্চিত অর্থের নিরাপত্তা থাকবে তো? শুধুমাত্র স্টেট ব্যাঙ্কের খেলাপীদের কাছে পাওনা ৮০ হাজার কোটি টাকা। আরও দশটা সরকারি ব্যাঙ্কের পাওনা দেড় লক্ষ কোটি টাকা। সর্বোচ্চ পর্যায়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে নিয়োগ শাসকের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল থাকার কারণে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের সর্বনাশ ঘটছে। অথচ ছোট মাঝারি ব্যবসায়ী, কৃষক, মধ্যবিত্ত, ছোট শিল্পের মালিক, তাঁতশিল্পী ইত্যাদিরা ব্যাঙ্কঋণ পেতে বিপর্যস্ত হয়। যদিবা পায় তা প্রয়োজনের তুলনায় কম। কৃষি বিপর্যয়, ফসলের দাম না পাওয়া, মহামারিতে (কোভিডকাল, বন্যা, খরা, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ইত্যাদি) তাদের গৃহীত ঋণের একটা ছোট অংশ মকুব করা হলেও তখন শাসকের প্রচারযন্ত্র তারস্বরে তা প্রচার করে। খেলাপীদের খেলাপের পরিমাণ জানার জন্য আর টি আই করে তা জানতে হয়। প্রচার হয় কম।

১৯৬৯ সালের ২৯ জুলাই ৫০ কোটি টাকা ও তার বেশি আমানত আছে এমন ১৪টি ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করা হয়। ১৯৮০ সালে আরও ৬ ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। গ্রামীণ ঋণ দানের দুটো উৎস অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস অর্থাৎ মহাজন, ব্যবসায়ী, আত্মীয় স্বজন, নানা এজেন্ট ইত্যাদি। এরা জাতীয়করণের আগে ১৯৫১-৫২ সালে গ্রামীণ ঋণের ৯২.৭ শতাংশ যোগান দিয়েছিল। জাতীয়করণের পর ২০০২ সালে ঐ উৎস থেকে যোগান আসে ৩৮.৯ শতাংশ। অন্য দিকে প্রাতিষ্ঠানিক উৎস অর্থাৎ সরকার, সমবায়, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, বিমা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি ৫১-৫২ সালে গ্রামীণ ঋণের ৭.৩ শতাংশ যোগান দিয়েছিল। জাতীয়করণের পর ২০০২ সালে গ্রামীণ ঋণের যোগান দেয় ৬১.৪ শতাংশ। সবুজ বিপ্লবের প্রসার, কৃষি ও গ্রামীণ ক্ষেত্রের উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক ও আর্থিক ক্ষেত্রের অবদান অস্বীকার করা যাবে না। জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটেছে। অথচ বলা হয় যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের কর্মকুশলতা বেসরকারি ব্যাঙ্কের সমতুল নয়। সরকারি ব্যাঙ্ককে রুগ্ন করার প্রচেষ্টা সরকারি নীতির মধ্যেই নিহিত। নানাভাবে সরকারি ব্যাঙ্ককে হেয় প্রতিপন্ন করে তাদের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে সরকারি প্রশাসন তৎপর। মূল উদ্দেশ্য সরকারি ব্যাঙ্কের শেয়ার বিক্রি ও বেসরকারিকরণ। তাহলে সরকারের দায়বদ্ধতা এড়ানো যাবে। ভারতে ব্যাঙ্কঋণ মকুবের মূল বেনিফিশিয়ারি হল কর্পোরেট ও বড় ব্যবসায়ীরা। এরা শাসকের প্রকৃত স্বজন। কেন তাদের কালো তালিকাভুক্ত করা হয় না? কারণ সরকারের শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি। দীর্ঘদিন ধরে সরকারি ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান অর্থনীতির মূল ভিত্তি গড়ে তুলেছে। এই ব্যবস্থা অর্থনীতিকে কিছুটা 'ইনসুলেটেড' করে রেখেছিল বলে ২০০৮ সালে বিশ্ব অর্থনীতির বিপর্যয়ের সময় ভারতীয় অর্থনীতিতে ক্ষতি হয়েছিল কম। দিন দিন সেই

—এরপর ছয়ের পাতায়

Visit Our Website : natunchithi.co.in

# নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৩

৪৬ বর্ষ ৪৮ সংখ্যা ১৮ ডিসেম্বর, ২০২৩, সোমবার, ১ পৌষ, ১৪৩০

## ফসলের ক্ষতিপূরণের দাবিতে কৃষক সভার ব্লক ও রাস্তা অবরোধ

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৫ ডিসেম্বর :** নিম্নচাপের বৃষ্টিতে আলু ও ধান এবং সব্জির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে চাষিদের। চাষিদের এই সর্বনাশের দিনে পাশে নেই স্থানীয় পঞ্চায়েত ও সরকার। সেই সঙ্গে সার ও আলুবীজ নিয়েও চলছে কালোবাজারি। এসবের বিরুদ্ধে ১৩ ডিসেম্বর জামালপুর ব্লক কৃষকসভার পক্ষ থেকে অসময়ে বৃষ্টির ফলে ধান, আলু ও সব্জির যে ক্ষতি হয়েছে তার ক্ষতিপূরণের দাবিতে এডিও অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

সেমারি ১ বিডিও অফিসে কৃষক সভা ও খেতমজুর ইউনিয়নের উদ্যোগে অকাল বৃষ্টিতে আলু ও চাষের ক্ষতিপূরণের দাবিতে ৭ দফা দাবিতে ডেপুটেশন দেওয়া ও বিক্ষোভ দেখানো হয়। কৃষক সভা খণ্ডঘোষ ব্লক কমিটির উদ্যোগে শালুন মোড়ে বর্ধমান-বাঁকুড়া রোডে আলু চাষি, ধান চাষিরা রাস্তা অবরোধ করে। ক্ষতিপূরণ, গোবিন্দ ভোগ ধানে রপ্তানি শুল্ক তোলা, প্রভৃতি ৭ দফা দাবিতে ব্লকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। রায়না, খণ্ডঘোষ ব্লকে চাষিরা ধান পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখায়।

আলু সহ বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিপূরণের দাবিতে মন্তেশ্বর বিডিওকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সারা ভারত কৃষক সভার মন্তেশ্বর ব্লক কমিটির উদ্যোগে এই কর্মসূচি সংগঠিত হয়।

আলু সহ বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিপূরণের দাবিতে মঙ্গলবার কালনা ১ ও ২ বিডিওকে পৃথকভাবে

—এরপর পাঁচের পাতায়

## শহীদ শিবশঙ্কর সেবা সমিতিকে অর্থদান

**নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৫ ডিসেম্বর :** প্রয়াত অধ্যাপক কল্যাণ ভট্টাচার্যের স্মরণে তাঁর সহধর্মিণী অধ্যাপিকা কল্যাণী ভট্টাচার্য শহীদ শিবশঙ্কর সেবা সমিতির রক্ষি ব্লাড সেন্টারের উন্নয়ন কল্পে তাঁর বাসভবনে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে চল্লিশ হাজার টাকার চেক তুলে দেন সেবা সমিতির সভাপতি ডাঃ তুষারকান্তি বটব্যালের হাতে। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার অছি পরিষদের সভাপতি ধীরেন্দ্রনাথ সুর ও সেবা সমিতির সম্পাদক সন্তরণ প্রামানিক, সহ সম্পাদক সমীর তরফদার, পার্থ গোস্বামী এবং অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য সহ পরিবারের সদস্যরা। উল্লেখ্য গত বছর (২০২২ সালে) শহীদ শিবশঙ্কর সেবা সমিতির উন্নয়নের জন্য অধ্যাপিকা কল্যাণী ভট্টাচার্য তিরিশ হাজার টাকা দান করেছিলেন। ইতিপূর্বে জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্যের স্ত্রী শোভা ভট্টাচার্যও কুড়ি হাজার টাকা দান করেছিলেন।

এদিনের আরেকটি অনুষ্ঠানে ডাঃ তুষার কান্তি বটব্যাল 'নতুন চিঠি' পত্রিকার উন্নয়নে কুড়ি হাজার টাকা তুলে দেন পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্যের হাতে।

## জলের ট্যাঙ্ক ভেঙে ৪ জনের মৃত্যু বর্ধমান স্টেশনে, জখম ৪০

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ১৫ ডিসেম্বর :** ১৩ ডিসেম্বর দুপুর ১২টা ১০ মিনিট নাগাদ বর্ধমান স্টেশনের ২ ও ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মের মাঝে জলের ট্যাঙ্ক ভেঙে চার জনের মৃত্যু হয়েছে। জখম হয়েছেন প্রায় ৪০জন। জখমরা বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মৃতদের মধ্যে একজন মহিলা ও দু'জন পুরুষ। মৃতদের নাম মাফিজা খাতুন (৩৫), ক্রান্তি বাহাদুর (১৭) ও সোনারাম টুডু (৩৫)। মাফিজার বাড়ি বর্ধমানের লাকুর্ডি কটিরাপোতা এলাকায়। ক্রান্তির বাড়ি বিহারের সাহেবগঞ্জে এবং সোনারাম ঝাড়খণ্ডের পাকুড়ের বাসিন্দা। এছাড়া টানা চার দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর ১৭ ডিসেম্বর মৃত্যু হয় সুধীর সূত্রধর (৬১) মেমারির কলেজ পাড়ার বাসিন্দা।

প্রথমে অল্প জল লিক করছিল। তারপরেই আচমকা ট্যাঙ্কটি ভেঙে পড়ে। বহু লোক জখম হয়েছেন। জিআরপি জখমদের উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসে। খবর পেয়ে হাসপাতালে আসে বর্ধমান থানার পুলিস। হাসপাতালের চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী ও নার্সরা অতি দ্রুততার সঙ্গে জখমদের চিকিৎসা শুরু করেন। হাসপাতালের সুপার ডাঃ তাপস ঘোষ এসেও তদারকি শুরু করেন।

যাত্রীদের অভিযোগ, দুর্ঘটনার পর জখমদের নিয়ে যাওয়ার জন্য রেলের তরফে কোনও রকম অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা হয়নি। টোটোয় করে জখমদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। স্টেশনের হকাররা উদ্ধার কাজে হাত লাগান। আরও জানা গিয়েছে, বেশ কিছুদিন আগে বর্ধমান স্টেশনের হকাররা ট্যাঙ্ক থেকে জল লিক নিয়ে রেল কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলেন। কিন্তু, তা মেরামতের জন্য কোনওরকম পদক্ষেপ নেয়নি রেল বলে অভিযোগ।

পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র বলেন, তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কারও দোষে এই ঘটনা ঘটলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

## ধাত্রীগ্রামে আবার আত্মঘাতী তাঁত শিল্পী

**নিজস্ব সংবাদদাতান, কালনা, ১২ ডিসেম্বর :** একসময় ছয়টা তাঁত নিয়ে দুই ভাই মিলে তাঁত কাপড়ের ব্যবসা শুরু করেছিলেন আত্মঘাতী তাঁত শিল্পী দয়াল বসাক (২৭)। কিন্তু এই ব্যবসা এতই মন্দার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল যে একে একে তাঁত বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছিল। শেষে দু ভাই দুটো তাঁত চালিয়ে কোনরকমে সংসারটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু শেষের দিকে এমনই অবস্থা দাঁড়ায় যে তাদের আর সংসারটা ঠিক মতো চলছিল না। শিক্ষিত দয়াল বসাককে এতে চরম হতাশা গ্রাস করে ফেলেছিল বলে জানান তার ভাই গোপাল বসাক।

### সিপিআই(এম) জেলা কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত সাত জন

১১-১২ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত জেলা কমিটির বর্ধিত অধিবেশনে তাপস বসু, সুদীপ্ত গুপ্ত, শুক্লা সরকার জেলা কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য হয়েছেন টিউলিপ ঘোষ, অন্তরা দত্ত, প্রবীর ভৌমিক, অমিত মণ্ডল।

## কৃষি ও তাঁতশিল্পকে বাঁচানোর দাবি ইনসাফ যাত্রায়

**নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৫ ডিসেম্বর :** ইনসাফ যাত্রার শুরুতেই শুক্রবার সকালে জনজোয়ার দেখা যায় কালনা মহকুমার পূর্বস্থলী-১ ব্লকে। ইনসাফ যাত্রার ৪৩ দিনে নসরতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোয়ালপাড়া থেকে এই যাত্রা শুরু হয়। এস টি কে কে সড়ক ধরে এই যাত্রা হেমাতপুর মোড়ে পৌঁছায়। সেখানে জনসভায় বক্তব্য রাখেন যুবনেত্রী মীনাক্ষী মুখার্জি, ধ্রুবজ্যোতি সাহা, বীরেশ্বর নন্দী, অয়ণাংশু সরকার প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন অমিত মণ্ডল। ইনসাফ যাত্রাকে সড়কের মোড়ে মোড়ে থামিয়ে পুষ্পস্তবক দিয়ে অভ্যর্থনা জানান এলাকার মহিলারা। কালনা মহকুমার তাঁতশিল্প নিবিড় এলাকাগুলি হল, কালনা শহর, কাদিপাড়া, নশরতপুর, সমুদ্রগর, মাজিদা, শ্রীরামপুর প্রভৃতি। এদিন মীনাক্ষী মুখার্জি বলেন, এখানকার দয়াল বসাকদের রাজ্য ও কেন্দ্র দুই সরকারই দেখছে না। তাই তাঁত শিল্পীদের আত্মঘাতী হওয়ার সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। এরা শিক্ষিত বেকার যুবকদের

—এরপর ছয়ের পাতায়

## খেজুর গুড়ের স্বাদ ভুলতে বসেছে বাঙালি

**কিশোর মাকর :** বিশ্ব উষ্ণায়ণের জেরে খেজুর রসের স্বাদ ভুলতে বসেছে বাঙালি। তেমন শীতের আর দেখা নেই গত কয়েক বছর ধরে। তার জেরেই আসল গুড়ের স্বাদ উবে গেছে। কমে গেছে সারি সারি খেজুরের গাছ। বাধ্য হয়ে শিউলিরা আশ্রয় নিচ্ছে কেমিক্যাল মিশ্রিত ভেজাল গুড়ে। সেই গন্ধে বাজার মও মও করছে। পিঠা পুলি তৈরিতে খেজুরের গুড়ের জুড়ি নেই। মাটির হাঁড়ি ক'দিন রৌদ্রে শুকিয়ে রস সংগ্রহের জন্য প্রস্তুত করা হয়। শীতের শুরুতে খেজুর গাছের পুরাতন ডালপালা কেটে দেওয়া হয়। যে দিকটায় রস সংগ্রহ করা হবে সেদিকে ত্রিভুজ আকৃতিতে গাছের গায়ে বেশি করে কাটা হয়। উপরের দুইদিকে দুটি শক্ত বাঁশের কঞ্চি বা ফলা গাছে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়, যাতে নির্ধারিত হাঁড়ি রশির মাধ্যমে ঝুলিয়ে রাখা সম্ভব হয়। গাছে ওঠা বা অবস্থানের জন্য শক্ত ও মোটা রশি ব্যবহার করা হয়। গাছের গায়ে নির্দিষ্ট উচ্চতায় পরপর ছোট ছোট বাঁশের টুকরা শক্ত করে বেঁধে দেয়া হয় যাতে গাছের শীর্ষে ওঠা নামা সহজতর হয়। আর রসের হাঁড়ি উঠানো ও নামানোর জন্য শিউলিরা তাদের দেহের পেছনে কোমরের দিকে একটি বাঁশের আংটা রশি দ্বারা ঝুলিয়ে রাখেন। সে আংটায় শূন্য হাঁড়ি ঝুলিয়ে বিকালে গাছে ওঠেন আর ভোরে রস ভরা হাঁড়ি আবার সেই আংটায় ঝুলিয়ে নিচে নেমে আসেন। প্রতিদিন দুপুরের পর হতে গাছের

—এরপর ছয়ের পাতায়

# গ্রন্থাগার দিবস-এর আহ্বান : সাধারণ গ্রন্থাগার বাঁচান

অরিন্দম কোঙার

### বিশেষ দিবস

ক্যালেন্ডারের পাতায় ৩৬৫টা দিন আছে। প্রত্যেকটা দিনই কাজের দিন। তবুও তার মধ্যে কোন কোন দিন বিশেষভাবে চিহ্নিত। যেমন পরিবেশ দিবস, মাতৃভাষা দিবস, বিজ্ঞান দিবস, সাক্ষরতা দিবস, মানবাধিকার দিবস, প্রতিবন্ধী দিবস ইত্যাদি। এই দিনগুলোর কোনটা সারা বিশ্বজুড়ে, কোনটা দেশজুড়ে, আবার কোনটা রাজ্যজুড়ে উদ্‌যাপিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে এইরকম একটা দিন 'গ্রন্থাগার দিবস'। প্রতি বছর ২০ ডিসেম্বর গ্রন্থপ্রেমী মানুষেরা গ্রন্থাগার দিবস গুরুত্ব সহকারে পালন করেন।

### ইতিহাস

১৯৫৩ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে 'গ্রন্থাগার দিবস' পালিত হয়ে আসছে। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত দিনটা ছিল ১৯শে আগস্ট। পুনর্গঠিত গ্রন্থাগার পরিষদের গঠনতন্ত্র গ্রহণের দিন অনুযায়ী, পরে হয় ২০শে ডিসেম্বর। তাই ২০২৩ সালের ২০শে ডিসেম্বর 'গ্রন্থাগার দিবস'। এই দিনেই অবিভক্ত বাংলায় ১৯২৫ সালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (তৎকালীন অল বেঙ্গল লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন) স্থাপিত হয়। সূত্রপাত হয় বাংলায় সংগঠিত গ্রন্থাগার আন্দোলনের। সংগঠিত বলা হচ্ছে এই জন্য যে - ১) অসংগঠিতভাবে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত উদ্যোগে বাংলায় অনেক গ্রন্থাগার আগেই স্থাপিত হয়েছিল এবং সেই সব গ্রন্থাগারের কোন-কোনটার সঙ্গে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের যোগাযোগ ছিল। ২) ১৯২৪ সালের ২৬-২৭শে ডিসেম্বর কর্ণাটক প্রদেশের বেলগাঁও শহরে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৩৯তম অধিবেশনের পাশাপাশি ২৬শে ডিসেম্বর স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা চিত্তরঞ্জন দাশের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয় প্রদেশে প্রদেশে গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপনের। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গ্রন্থাগার সংগঠন, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপিত হয়। সংগঠনের প্রথম সভাপতি রবীন্দ্রনাথ।

চিত্তরঞ্জন দাশ সভাপতির ভাষণে বলেন, "আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে, যখন দেশ ও জাতির স্বার্থে সমগ্র জনশক্তি নিয়োজিত, যখন তীব্র আন্দোলন এবং কঠিন সংগ্রাম চলছে, তখন আমাদের জাতীয় প্রয়োজন আমাদের দৃষ্টিপথে থাকা একান্ত আবশ্যক, কারণ আমাদের এই কর্মপ্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য জাতি গঠন, কেবলমাত্র শাসনক্ষমতা দখল নয়। স্বরাজ সম্বন্ধে এই মতবাদই আমি বরাবর পোষণ করে এসেছি এবং যাঁরা স্বরাজ বলতে কেবল স্বায়ত্তশাসন, এমনকি রাজনৈতিক সাধারণ অর্থে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বোঝান তাঁদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছি। জনসাধারণ যাতে জাতি গঠনের কাজকে সহজ উপায়ে সম্ভব করে তুলতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখাই একজন রাজনীতিকের কর্তব্য এবং এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা মূল লক্ষ্য সাধনের ক্ষেত্রে হাতিয়ার বিশেষ।" (গ্রন্থাগার আন্দোলন) চিত্তরঞ্জনের এই বক্তব্য থেকে এটা পরিষ্কার যে আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা চাই এবং সেই স্বাধীনতাকে কাজে লাগাতে হবে দেশ গঠনের জন্য, জাতি গঠনের জন্য অর্থাৎ দেশের মানুষকে অর্থনৈতিক, সামাজিক, মানসিক, শারীরিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধ করে তোলার জন্য, সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার জন্য। এইভাবেই স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে যুক্ত করার এবং স্বাধীনতার পর জ্ঞানসমৃদ্ধ উন্নত চেতনাসম্পন্ন বিজ্ঞাননমনস্ক মানুষ গড়ে তোলার জন্য গ্রন্থাগার আন্দোলনের কাছে আহ্বান জানান চিত্তরঞ্জন।

ঔপনিবেশিক শাসনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলায় সাধারণ মানুষের গ্রন্থাগার আন্দোলনের উদ্যোগে স্থাপিত কোন কোন গ্রন্থাগার সংগ্রামের যোগসূত্র হয়ে উঠেছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামী ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "এই সময় (বিশ শতকের প্রথম ভাগ) নানা বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের সুদৃঢ় বুনিয়াদ গড়িয়া তুলিবার জন্য ইহারা লোক সংগ্রহের দিকে নজর দিল। চেতনাহীন মানুষের মধ্যে চেতনা সঞ্চার করিতে হইলে তাহার মনোরাজ্যে সর্বপ্রথম উদ্দীপনার ভাব সৃষ্টি করা প্রয়োজন। ভাব প্রচার করিতে হইলে অনুরাগ সাহিত্য রচনা অবশ্য কর্তব্য। মৌলিক সাহিত্য তো কিছু সৃষ্টি হইলই অধিকন্তু বিদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সঙ্কলন ও প্রচার চলিতে লাগিল। এই পুস্তকগুলি যাহাতে সকলে পাঠ করার সুযোগ পায় তাহার জন্য স্থানে স্থানে স্থাপিত হইল ছোট ছোট সর্বজনীন গ্রন্থাগার। এই গ্রন্থাগারই আমাদের রাজনৈতিক চেতনা ও সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনের চিন্তা জাগাইতে বিশেষভাবে সহায়ক হইয়াছিল।" (বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন) ধীরে ধীরে অসংগঠিত থেকে সংগঠিত রূপে স্বাধীনতা সংগ্রামের একটা অংশ হয়ে উঠেছিল গ্রন্থাগার আন্দোলন। এই ধারা বজায় থেকেছে এবং আজও গ্রন্থাগার পরিষদ এই ধারা বজায় রাখার চেষ্টা করছে।

সুতরাং এটা স্বাভাবিক যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে সমাজ ও রাষ্ট্রকে গুরুত্ব দিয়েছে। সংগঠন যে সব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করেছে, তার মধ্যে আছে– ১) বাংলায় গ্রন্থাগার আন্দোলন বৃদ্ধি করা, ২) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গ্রন্থাগার গঠন ও পরিচালনার জ্ঞান পরিব্যাপ্ত করা এবং গ্রন্থাগার নিয়ে আলোচনা, বক্তৃতা, সম্মেলন ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা, ৩) অ্যাসোসিয়েশনের সমস্ত বা কোনও একটা উদ্দেশ্যের জন্য গঠিত শিক্ষার বিস্তারে নিয়োজিত অন্যান্য গ্রন্থাগার সংগঠন ও সহযোগী সংগঠন স্থাপন ও উৎসাহিত করা। এই রকম ২০টা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিষদের গঠনতন্ত্রে নির্দিষ্ট করা আছে। এইসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে বোঝা যায় যে পরিষদ ইয়াসলিক (ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব স্পেশাল লাইব্রেরিজ অ্যান্ড ইনফরমেশন সেন্টারস), পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির মতো গ্রন্থাগার সংগঠনগুলোকে নিয়ে যৌথ আন্দোলন গড়ে তুলতে সচেষ্ট। শুধু তাই নয়, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, কিশোর সংগঠনের সঙ্গে যৌথ কর্মসূচি গ্রহণ করায় গ্রন্থাগার পরিষদ আন্তরিক। তাই প্রতি বছর 'গ্রন্থাগার দিবস'-এ এইভাবে আন্দোলন ও কর্মসূচি গ্রহণ ও রূপায়ণের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করা হয়, প্রকাশ্যভাবে মত বিনিময় করা হয়।

### স্বাধীনতার পর

ইতিহাস নিয়ে কেবল গর্ব বোধ করলেই চলে না, সেই ইতিহাসের উজ্জ্বল দিক বহন করে নিয়ে যেতে হয়, ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করতে হয়। দেশ স্বাধীন, স্বাধীন দেশের সংবিধান আছে। দেশ গড়ায় সরকারের দায়িত্ব আছে, আছে নাগরিকদের দায়িত্ব। দেশ গড়তে মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করতে হয়–খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থান, কাজ ইত্যাদি। দেশ স্বাধীন হবার পর সাড়ে সাতটা দশক পেরিয়ে গেল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষের এই চাহিদাগুলো অনেকাংশে পূরণ হয়নি। ফলে স্বাধীন দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ শারীরিক, মানসিক, সামাজিক দিক দিয়ে বলিষ্ঠ নাগরিক হয়ে উঠতে পারেনি। ২০২৩ সালের বিশ্ব ক্ষুধা সূচক বা গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্সে ১২৫টা দেশের মধ্যে ভারতের স্থান হচ্ছে ১১১তম।

এই অসম্পূর্ণতার অন্যতম পরিচয় হচ্ছে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সেই সম্প্রসারণ দেশে হয়নি। পশ্চিমবঙ্গেও তাই। ১৯৪৭-৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে সরকারি ও সরকার-পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগার ছিল ৭৬১। কিন্তু ১৯৭৭-২০১১ সালে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে রাজ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বড় ধরনের উল্লম্ফন হয়, গ্রন্থাগার পরিষেবার পরিমাণগত ও গুণগত উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটে। রাজ্যে সরকারি ও সরকার-পোষিত গ্রন্থাগারের সংখ্যা দাঁড়ায় ২,৪৬৮। সরকারের গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তর হয়, দপ্তরের মন্ত্রী থাকেন, পৃথক ডাইরেক্টরেট চালু হয়। সাধারণ গ্রন্থাগার আইন হয়। আইন অনুযায়ী গ্রন্থাগারবিধি হয়। গ্রন্থাগার সংক্রান্ত নীতি ও কর্মসূচি নির্ধারণে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদসহ অন্যান্য গ্রন্থাগার সংগঠন, স্বশাষিত সংস্থা, গ্রন্থাগার কর্মী, গ্রন্থাগারের পাঠক বেশি বেশি গুরুত্ব পায়। কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা, রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশনের সঙ্গে সহযোগিতা বাড়ে। রাজ্য ও সেই সঙ্গে জেলায় জেলায় গ্রন্থমেলা চালু হয়। গ্রন্থমেলা তো নয়, গ্রন্থকে কেন্দ্র করে যেন শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উৎসব। সরকারি এই উদ্যোগের ফলে বেসরকারি উদ্যোগেও অনেক গ্রন্থমেলা হতে থাকে, যার রেশ এখনও আছে। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এই ৩৪ বছরে ৩৪১টা জনগ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রও স্থাপন এগোতে থাকে।

### বর্তমান বাস্তবতা

২০১১ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য পরিচালনা করছে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার। সরকারের গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তর আছে। দপ্তরের পূর্ণমন্ত্রী আছেন। সরকারের অন্যান্য দপ্তরের মন্ত্রীর সঙ্গে এই দপ্তরের মন্ত্রীরও সুযোগ-সুবিধা বাড়ে। তবে রাজ্যে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন বাড়ে না। বাড়ে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অধঃপতন। এই অবনমন বাড়তে বাড়তে এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে রাজ্যে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা অবলুপ্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এ এক অভিনব অভিজ্ঞতা। স্বাধীনতার পর রাজ্যে এমন অভিজ্ঞতা আগে কখনও হয়নি।

সুতরাং এখন আর কেবল গতানুগতিকভাবে 'গ্রন্থাগার দিবস' পালনের অবকাশ নেই। গতানুগতিক বলা হচ্ছে এই কারণে যে, প্রতি বছর 'গ্রন্থাগার দিবস' পালিত হয়। আলোচনা হয়, প্রস্তাব নেওয়া হয়, দাবি উত্থাপন করা হয়। পরবর্তীকালে গ্রন্থাগার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে 'গ্রন্থাগার দিবস'-এর বার্তা খানিকটা প্রচারিত হয়, কিন্তু ক্রমশ আন্দোলনে ভাঁটা পড়ে। ফলে গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারকর্মী, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষাপ্রাপ্ত বেকার, গ্রন্থাগারের পাঠকদের দুরবস্থা বাড়ে। এমন বিপরীতগামিতা আটকাবে কে? ইতিহাস কী বলে? তা হচ্ছে

—এরপর ছয়ের পাতায়

# বিজ্ঞান চেতনা প্রসার অভিযান কেন হচ্ছে

তাপস সামন্ত

স্বাধীনতার পর থেকেই আমাদের দেশে সেকুলারিজম-এর অর্থ হিসাবে ধর্ম-কে রাষ্ট্র থেকে পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করার ধারণা কখনোই সামনে আনা হয়নি। আবার, ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটা দিয়ে রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করার ধারণাটিও স্পষ্ট হয় না। তার ফলে আধুনিকতার ধারণাও আমাদের দেশে অস্পষ্ট থেকে গেছে। এই অস্পষ্টতা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। সেই কারণেই ভারতের জনমানসে গণতন্ত্র সম্পর্কে আধুনিক মূল্যবোধ, সহিষ্ণুতা ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের মানসিকতা আজও অপ্রতুল। আমাদের সংবিধানের ৫১-AH ধারায় উল্লিখিত বক্তব্য ঃ 'To develop scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform'-কে মেনে চলতে আজ আর কোনো নাগরিকই আগ্রহী নয়। বাস্তবে এই মতাদর্শগুলি সাধারণ মানুষের চেতনায় শক্তি সঞ্চার করতে না পারায়, গণতন্ত্র আমাদের দেশে সংখ্যাগুরুর ক্ষমতা ও অসহিষ্ণুতার অভিপ্রায় হয়ে উঠেছে। সামাজিক স্তরবিন্যাসকে মেনে নেওয়ার মধ্য দিয়ে এক রহস্যময় কর্তৃত্ববাদ আমাদের দেশে যুক্তিবাদকে পুরোপুরি অপ্রাসঙ্গিক করে তুলেছে। সেই কারণেই উদারবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা বাদে ভারতে খুব অল্পসংখ্যক মানুষই গণতন্ত্র, সহিষ্ণুতা ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ মেনে চলে। কারণ, আমাদের দেশে রাষ্ট্র সমাজের সবকটি স্তরকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে যে, উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে কোনো গুণগত বদল না এনেই এর উপরিকাঠামোকে ভেঙে ফেলতে সক্ষম হয়েছে। সারাদিনে মানুষ ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা মানসিক বা দৈহিক শ্রমশক্তি বিক্রি করার পর তার আর নিজের শিকড়ের দিকে তাকানোর সময় থাকছে না। এই বাস্তবতা সমাজ-মনস্তত্ত্বে ঐক্যের শক্তিকে দুর্বল করছে এবং অযুক্তিকে শক্তিশালী করছে। তত্ত্ব হিসাবে তাই উত্তর-আধুনিকতাবাদ এই সমাজ-মনস্তত্ত্বকে গ্রহণযোগ্য ও মান্য করে তুলছে। গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের মতো সামন্ততান্ত্রিক ধারণাগুলিকে, অতীতমুখী ফোক এনলাইটমেন্ট কিংবা উত্তর-আধুনিকতার আবরণ দিয়ে এমনভাবে নির্মাণ করা হচ্ছে যা মানুষকে সহজেই আকৃষ্ট করে তুলছে।

ভারতে হিন্দুত্ববাদীরা যতই শক্তিশালী হচ্ছে ততই উত্তর-আধুনিকতার নামে অতীতমুখী ফোক এনলাইটমেন্টকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। মেঘনাদ সাহার 'সবই ব্যাদে আছে'-এর ব্যঙ্গ আজকে একমাত্র সত্য হয়ে উঠেছে। তাই এই অতীতমুখিনতার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে হলে আমাদের শুধু প্রযুক্তিগত হার্ডওয়্যারের উপর নির্ভরশীল হলে চলবে না।

প্রতিস্পর্ধী সাংস্কৃতিক সফটওয়্যারেরও বিনির্মাণ করতে হবে। যার অন্যতম একটি উপাদান হল বিজ্ঞান সংস্কৃতি ও জনবিজ্ঞান আন্দোলন। প্রকৃতি, সমাজ ও ব্যক্তিমানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তনকে যদি ধারাবাহিকতার ইতিহাস হিসাবে দেখা যায়, তাহলে সমাজ-জিজ্ঞাসা, প্রকৃতি-জিজ্ঞাসা ও ব্যক্তিমানুষের জিজ্ঞাসাকেও পুনর্নির্মাণ করা যায়, বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের সাহায্যে। প্রতিহত করা যায় উত্তর - আধুনিকতাবাদীদের 'Modernisation without Modernism' কে। তাহলে সায়েন্টিফিক টেম্পার বা বিজ্ঞাননমনস্কতাকে বাদ দিয়ে বিজ্ঞানের সুযোগ নেওয়া থেকেও মানুষকে কিছুটা হলেও পৃথক করা যায়। আসলে উৎপাদন, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রের মিথস্ক্রিয়ায় নির্মিত পরিচালন-পদ্ধতি থেকে সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের উপাদানগুলিকে পৃথক করতে পারছে বলেই এক বিকৃত-আধুনিকতা আমাদের সমাজে প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল। সেইজন্য ভারতে বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের, বিশেষ করে জনবিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মীদের কাছে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সঙ্গে অযুক্তি দ্বারা খণ্ডায়িত সমাজের পার্থক্য দূর করতে বহুমাত্রিক লড়াই ও বিদ্যাচর্চার গুরুত্ব অপরিসীম। হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক তত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম যে গুণগতভাবে পৃথক তা আজ বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ দ্বারা ব্যাখ্যা করা একান্ত প্রয়োজন। যদিও, হিন্দুত্ববাদীরা এই যুক্তিবাদী তার্কিক পরম্পরাকে অস্বীকার করে, মূলতঃ বিকৃত সাম্প্রদায়িক প্রচার ও মেকি দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলার জন্য। যা তাদের অন্যতম রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। অথচ, ভারত-ইতিহাসের মধ্যে অন্তর্লীন বহু-ধর্ম ও বহু-সংস্কৃতির সহাবস্থানের প্রবণতা থেকেই প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান ও গণিতের বিকাশ ঘটেছিল। গুপ্তযুগে, বিশেষ করে আর্যভট্ট ও বরাহমিহির-এর সময়ে ভারতীয় বিজ্ঞান ও গণিতে যে উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটেছিল, তা বৌদ্ধিক দিক থেকে বহু- ধর্মের অস্তিত্বকেই স্বীকার করে।

সেইজন্যই স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে আকর্ষণীয় উন্নতি ও রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের পরিকল্পিত উদ্যোগে দেশের স্বনির্ভরতার ভিত্তি তৈরি হয়েছিল। যদিও তার সুফল দেশের বড় অংশের মানুষের কাছে পৌঁছায়নি। অথচ বর্তমান সময়ে দেশের স্বনির্ভরতার ভিত্তিস্থাপনকারী এই সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকেই ধ্বংস করা হচ্ছে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ধারাবাহিকভাবে বিজ্ঞাননমনস্কতার উপর আঘাত, পরিকল্পিতভাবে অপবিজ্ঞানে উৎসাহ দেওয়া ও পাঠক্রম থেকে মৌলিক বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি বাতিল করা হচ্ছে। এরই সাথে ধর্মীয় পুঁথিকে বিজ্ঞানের আকর বলে চিহ্নিত করা, হিন্দু ধর্মতত্ত্বকে ভারতীয় দর্শন ও হিন্দু পৌরাণিক কাহিনিগুলিকে বিজ্ঞান বলে দাবি করা হচ্ছে। ২০১৫ সাল থেকে বিজ্ঞান কংগ্রেসের মঞ্চকে ধারাবাহিকভাবে অপবিজ্ঞান প্রচারের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। অতীত ভারতের বিজ্ঞান-গরিমা বিষয়ে এমন সমস্ত কল্পিত দাবি তুলে ধরা হচ্ছে, যার কোন প্রামাণিক ভিত্তি নেই। ভারতের প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডারের নামে জ্যোতিষচর্চা ও বৈদিক গণিতকে পাঠ্য করা হচ্ছে। পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে বিকৃত ইতিহাস।

যুক্তিবর্জিত, বিশ্বাসনির্ভর ও বৈজ্ঞানিক চেতনা বিচ্ছিন্ন করে যদি আজকের প্রজন্মকে এইভাবে গড়ে তোলা হয়, তাহলে আগামীদিনে ভারতে মৌলিক বিজ্ঞান গবেষণা বহুগুণ পিছিয়ে পড়বে। সেই সঙ্গে মত প্রকাশ ও ভিন্নমত হওয়ার অধিকার আজ কেড়ে নেওয়া হচ্ছে এবং ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা ও বিচারের পরিবেশ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। বিপন্ন হচ্ছে দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়সংহতি, স্বনির্ভরতা ও সার্বভৌমত্ব।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞাননমনস্কতার প্রসারকে মুখ্য উপজীব্য করে ভারত জুড়ে সারা ভারত জনবিজ্ঞান নেটওয়ার্ক ২৩ টি রাজ্যের ৪০ টি বিজ্ঞান

—এরপর পাঁচের পাতায়

# নবান্ন উৎসব ঃ এখনো গ্রামে উন্মাদনা জাগায়

**তপোময় ঘোষ**

চারিদিকে এত অবক্ষয়, এত ঐতিহ্য পরম্পরা বিলুপ্তির পরেও গ্রাম ভারতে বিশেষত গ্রামবাংলায় এখনও নবান্ন উৎসব গ্রামে উন্মাদনা জাগায়, মাতিয়ে তোলে শান্ত স্তব্ধ গ্রামগুলিকে। এর অনেক প্রস্তুতি ভৌগোলিক সামাজিক প্রেক্ষিতে রয়েছে। আমাদের এই বাংলা ভারত উপমহাদেশের সেই ভূখণ্ড, যা মৌসুমী জলবায়ু অধ্যুষিত এবং এখনকার আবহাওয়ার বাৎসরিক ষড়ঋতুতে বিভক্ত। এখানকার ভূপ্রকৃতি তথা মাটির গঠন গঙ্গানদীবাহিত পাললিক মৃত্তিকা দ্বারা আবৃত। ফলে জৈবিক কারণেই এখানে নীবার জাতীয় একটি স্বাভাবিক উৎপাদক উৎপাদনস্থল। এখানকার আবহাওয়া জুন-জুলাই-আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর এই চারমাস মৌসুমী জলবায়ুর দ্বারা আর্দ্র ও বর্ষণসিক্ত থাকে। ফলে আদিমকাল অর্থাৎ মানুষের পশুপালন ও কৃষিকাজ শুরুর সময় থেকেই এখানে নীবার জাতীয় দেশীয় ধান্যের স্বাভাবিক জন্ম ও বৃদ্ধি ও ফলন ঘটে। আদিম মানুষ কৃষিকাজ শুরুর সময়েই এই ধানের খোসা (তুষ) ছড়িয়ে তণ্ডুল আবিষ্কার করে, তা খেতে শুরু করেছিল এবং এর স্বাদের এবং পুষ্টির মজা অনুভব করে একে পুনরুৎপাদন বা চাষ করার দিকে নজর দেয়। সেই অনুযায়ী বছরের ষড়ঋতুর প্রথম ঋতু গ্রীষ্মের শেষ অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রাক্ বর্ষা বৃষ্টির ফলে জমিতে জোর এলেই হাল বলদ কর্ষণ করে প্রাক্ বর্ষা জমি প্রস্তুত শুরু করত। এবং বর্ষার প্রারম্ভে বৃষ্টির পর্যাপ্ত জল পেতেই কাদায় সেই চষা জমির আগাছা ঘাসকে কাদার মধ্যে ঢুকিয়ে পচিয়ে সবুজ সার তৈরির জন্য মই দিয়ে জমিকে ধানচারা রোয়ার উপযোগী করে তুলতো। তারপর আবার শ্রাবণ (জুলাই) মাসে সেই জমিতে ধানের চারা রুইয়ে দিত। দেশি এবং দীর্ঘমেয়াদী এইসব ধান চারমাস পর আশ্বিন-কার্তিকে (অক্টোবরে) পুষ্পমঞ্জুরি বা শিষ বর্ধিত করত। এবং জীবনানন্দ দাশের কার্তিকের সেই ধান পেকে উঠত। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর কৃষক এই পক্ক শস্য ঘরে তোলার জন্য কাস্তে হাতে মাঠে নেমে পড়ত। তারপর, সেই নতুন ধান ঘরে এনে তার নতুন চাল আনুষ্ঠানিকভাবে নবান্ন উৎসবের মাধ্যমে সাড়ম্বরে গ্রহণ করত। এজন্য প্রস্তুতির অন্ত থাকত না। তার প্রেক্ষিতও অবশ্য ছিল।

কেমন সে নবান্নের প্রস্তুতি? হয়ত যে কলার কাঁদিটা আশ্বিন বা কার্তিকেই কাটা যেত, তাকে অপেক্ষায় রেখে এই অঘ্রানেই কাটা হয়। খামারের পাশে একটু কুপিয়ে যে পালং শাক বা মুলো বোনা হয়েছিল সেই শাক না তুলে এদিনের জন্য অপেক্ষা। ক্ষেতের বেগুনটা, আখটাও এদিনের অপেক্ষায় থাকত। তারপর এই অঘ্রানে গ্রামের মোড়ল, প্রবীণ এবং বিচক্ষণ মানুষরা চণ্ডীমণ্ডপে বা কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে মিলিত হয়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এই নবান্নের একটা তারিখ নির্ধারণ করেন। এখন অবশ্য ব্যস্ত জীবনে ছেলেমেয়েদের স্কুল কলেজ অফিস ইত্যাদির কথা মনে রেখে সাধারণ শুক্লাতিথির কোন এক রবিবার দেখে এই নবান্নের দিন নির্ধারিত হয়। এবার এই নবান্নের দিনে কিষাণ কিষাণীর ব্যস্ততা চোখে পড়ার মতো।

গৃহস্থ কৃষক হয়ত তার শরিকানার পুকুরের মাছ ধরাতে এবং তার ভাগ আনতে ব্যস্ত। গৃহস্থের পুত্রটি ব্যস্ত থাকে কলাগাছের পাতা সংগ্রহে। কারণ থালা বাটিতে নয়, এই কলাপাতায় পাত পেরে এই নবান্ন গ্রহণ করা হয়। গৃহিনী তার শুদ্ধ গরদের শাড়িটি বের করে পরে সকালে তার পুকুরঘাটে। স্নান সেরে দূর্বা এবং ফুল সংগ্রহের জন্য সদ্যস্নাতা ভিজে চুলের নাতনিটিকে সঙ্গে নেন। গৃহবধূটিও ব্যস্ত থাকেন, ফলমূল এবং সবজি, আনাজ কাটাকুটোর কাজে। তারপর একসময় গ্রামের বা পরিবারের ইষ্টদেবতার উদ্দেশ্যে পুজো দেওয়া হয়। পূজোর সময় বাড়ির কর্তা তার পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে এই নবান্নের পুণ্যলগ্নে শ্রদ্ধাপূর্বক নতুন অন্ন অর্পণ করেন কাক সহ অন্যান্য পাখপাখালিদের উদ্দেশ্যে। গোবর নিকানো উঠানে বাড়ির সামনের নিকানো পথে ছড়িয়ে দেওয়া হয় আতপ চাল এবং ইষ্ট দেবতার প্রসাদ। গৃহদেবতা, বাস্তুদেবতার প্রসাদ সহ ওই নতুন চালের প্রসাদ উৎসর্গ করা হয়। এরপর অন্যান্য দিনের তুলনায় অনেক বেশি উপকরণে ঝদ্ধ ও যত্ন সহকারে রন্ধনকৃত পঞ্চব্যঞ্জন ও ওই নতুন চালের অন্ন সপরিবারে তো বটেই, পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয় সমভিব্যহারে তৃপ্তি সহকারে গ্রহণ করা হয়। এরই নাম নবান্ন বা পোশাকি নাম নবান্ন। যদিও কখনো মনে সংশয় জাগে, এই প্রাচীন আবহমানকালের গ্রামীণ পার্বণ উৎসব এক সময় উঠে যাবে। আধুনিক প্রজন্ম কর্তৃক পরিত্যক্ত হবে অচিরেই। কিন্তু তখনই কানে আসে এই প্রজন্মের ছেলে-ছোকরাদের দ্বারা নতুন উদ্যম নতুন নতুন উৎসাহের মাইক সাউন্ড বক্স আর ডিজের বাজনা। বিকালে খেলার মাঠে ক্রিকেট ফুটবল কিংবা ভলিবল ম্যাচ আয়োজনের উন্মাদনা। কোথাও বিকালে কবিতা, দেশজ লোকসংস্কৃতির আঙ্গিক কবিগান /কবির লড়াই, কোথাও লোটো/আলকাপ,কোথাও আধুনিকতার অর্কেস্ট্রা বা ব্যান্ডের গান, কোথাও যাত্রাপালা /কীর্তন অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। আর তখনই মনে হয়, নবান্ন এখুনি বিলুপ্ত হচ্ছে না। যেহেতু নবান্নের দিনে বেশি বেশি পঞ্চব্যঞ্জন বেশি বেশি করে যত্ন সহকারে এবং ভাল করে রান্না করা হয়ে থাকে, তাই ওইদিন সব কিছু খেয়ে ফুরোয় না, কিছু থেকেই যায়। গ্রামবাসী গৃহস্থের ছেলেপুলে পরদিন তাই মহানন্দে বাসি বা পান্তা খাবার খেয়ে সোৎসাহে 'পান্তা নবান' পালন করে। ইদানীং ওইদিন গ্রামে গ্রামে পান্ত কার্তিক পুজোর বাহুল্য দেখা যাচ্ছে। তার মাইকের অত্যুগ্র ব্যবহার অনেকের বিরক্তির কারণ হয়ে উঠছে।

# বর্ষাকালীন পেঁয়াজ খুবই লাভজনক চাষ

**নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ১৬ ডিসেম্বর** : চরম মন্দার বাজারে কৃষিকে কি করে লাভজনক করে তোলা যায়, তা হাতে কলমে করে দেখালেন পূর্বস্থলী-২ ব্লকের কালেখাতলা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের আমজেদ শেখ। তিনি এই মরশুমে চার বিঘা জমিতে বর্ষাকালীন পেঁয়াজ চাষ করেছিলেন। ইতিমধ্যেই পেঁয়াজ উঠতে শুরু করেছে। আমজেদ শেখ জানালেন, প্রতিবিঘা জমিতে ৭০ থেকে ৮০ মন পেঁয়াজের ফলন হচ্ছে। তাতে খরচ বাদ দিয়ে বিঘা প্রতি লাভ হচ্ছে ৩৫ থেকে ৪০ হাজার টাকা। উল্লেখ্য বাংলার ভাতঘর বলে খ্যাত পূর্ব বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কৃষিপ্রধান মহকুমার মধ্যে অন্যতম কালনা। এই মহকুমার পাঁচটি ব্লকই কৃষিতে সমৃদ্ধ।

তবে পূর্বস্থলী-২ ব্লক কৃষিতে বৈচিত্র্য এনেছে। এই ব্লকে চিরাচরিত ধান, পাট চাষকে কমিয়ে ফল, ফলের গাছ, সবজি ও ফুল নার্সারির দিকে ঝুঁকেছে এখানকার মানুষ। তাতে এই এলাকার কৃষকরা শুধু আর্থিক ভাবেই উন্নতি করেনি, পাশাপাশি এই বিকল্প ভাবনায় বহু মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। এবার এই ব্লকে বিকল্প ফসল হিসেবে জায়গা করে নিল বর্ষাকালীন পেঁয়াজ।

—তিনের পাতার পর

## কৃষক সভার ব্লক ও রাস্তা অবরোধ

স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সারা ভারত কৃষক সভা ও সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়নের কালনা ১ ও ২ ব্লক কমিটির উদ্যোগে এই কর্মসূচি সংগঠিত হয়। স্মারকলিপি দিয়ে দাবি করা হয়, সম্প্রতিককালের নিম্নচাপের বৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আলু সহ বিভিন্ন ফসলের। এই অবস্থায় কৃষকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও সার-বীজ সরবরাহ করতে হবে। প্রত্যেক কৃষকের কৃষি ঋণ মুকুব করতে হবে। সার ও বীজের কালোবাজারি বন্ধ করার উদ্যোগ নিতে হবে। এই দাবিগুলির সমর্থনে কৃষক নেতারা বক্তব্য রাখেন।

কৃষক নেতা শ্যামল পালের নেতৃত্বে ছয় জনের একটি প্রতিনিধি দল কালনা-১ ব্লকের বিডিওকে স্মারকলিপি প্রদান করেন। অন্যদিকে সন্দীপ দুবের নেতৃত্বে পাঁচজনের একটি প্রতিনিধি দল কালনা-২ বিডিওকে স্মারকলিপি দেন। দুই বিডিও এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন।

বৃষ্টিতে ও মিগজাউম ঘূর্ণিঝড়ে সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। জমির পর্চা ও দলিল দেখে নয় প্রকৃত চাষিদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে। রাসায়নিক সারের কালোবাজারি রুখতে কৃষি দপ্তরকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আলু চাষিদের সার ও বীজে ভর্তুকি দিয়ে সরকারকে সরবরাহ করতে হবে। শস্য বিমার নামে চাষিদের হয়রানি বন্ধ করে , সমস্ত কৃষকের কৃষিঋণ মকুব করার দাবিতে গলসী-২ ব্লক অফিসে আধিকারিকের কাছে এবং এ ডি ও গলসী-২-এর কাছে সারা ভারত কৃষক সভা গলসী-২ নং ব্লক কমিটি স্মারকলিপি প্রদান করে।

# আমরা সবাই গাধার টুপি মাথায়

**বিশ্বম্ভর মণ্ডল**

কী লিখব, কেন লিখব সেটাও মন আজকাল জানতে চায়। কিছুই তো বদলাচ্ছে না। কানের কাছে মনের কাছে মাছি ভ্যানভ্যান করে চলেছে 'লিখে কি আদৌ বদলানো যায় কিছু!' 'জো হুজুরের দল' মাথায় উঠল, দিন বদলালো কোথায়! যারা পড়তে ভুলে গেছে, তারা পাতার পর পাতা লিখেই চলেছে। যাদের লেখা দরকার, 'প্রতিষ্ঠান' তাদের জায়গা দেয় না। 'প্রতিষ্ঠান' বড় কঠিন ঠাঁই, দেখতে নির্বিষ, কিন্তু তাকে ঘিরে ফেলা মানুষগুলো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য রেখে চলে, 'অনিমন্ত্রিত' বা 'অবিশিষ্ট' কেউ যেন না ঘরে ঢুকে পড়ে।

যাদেরকে মাথায় নিয়ে নাচার কথা, তাদেরকে ভরসা দেবার লোক নেই রাস্তায়। রাস্তাও বেশিরভাগ সময়েই বড় ফাঁকা আজকাল। কারা সত্যিই ছুটছে আর কারা ছোটার অভিনয় করছে বোঝা কঠিন। মাঝে মাঝে মনে হয় কেউ ছুটছে না। থেমে গেছে শহর, থেমে আছে গ্রাম। চটকের আস্তরণে মুখ চেনা দায়।

শব্দের জন্ম থেমে নেই। কিন্তু সে শব্দে প্রাণ আছে আদৌ! নিস্তরঙ্গ চারদিক। ছুটছে যারা, তারাও ধাক্কা খেয়ে ছুটছে, প্রাণহীন সে ছোটা, লক্ষ্যহীনও বটে। জ্যোতিষীর চেম্বারে, রাস্তার ধারে শনি মন্দিরে ভিড় বেড়েই চলেছে। সাইকোলজিস্ট-এর চেম্বারেও ভিড় বাড়ছে, যদিও সেখানে যেতে দ্বিধা কাটেনি আজও। জগদ্দল পাথর চারদিকে। ঝাঁকুনি দেওয়া জরুরি, দেবার লোক নেই। মানুষের কিছুই মনে থাকছে কিনা—সেটাও বোঝার উপায় নেই—কারণ ভোটের অধিকার হারিয়েছেন প্রায় সবাই।

প্রেমের আর প্রকৃতির কবিতা আর গদ্য লিখেই দায়িত্ব শেষ মনে হচ্ছে অনেকেরই। অনেক লেখক, কবি তাদের সামাজিক দায়িত্বের কথা ভুলে গেছে কবেই। পত্রিকার পাতায় নাম ছাপানো আর টিভিতে মুখ দেখানোর বেপরোয়া দৌড় বাড়ছে। 'নিরপেক্ষ' সাজে 'পক্ষপাত' চারদিকে। সব গা সওয়া আজ। ঘড়ির কাঁটা থেমে গেছে, দেখার বা বলার লোক নেই। প্রায় সবাই উৎসবে ব্যস্ত। আখের গোছানোর লোক বেড়েই চলেছে। রাজাকে কী বলা দরকার সেটা ভাবার লোক কমে যাচ্ছে, রাজা কি শুনতে চায় সেটাই রাজাকে শোনানো হচ্ছে। মানুষের বাড়ি যাবার লোক কমে গেছে, মোসেজ পাঠিয়েই দায়িত্ব শেষ করে দিচ্ছে অনেকেই। বেশির ভাগই জানতে চাইছে না মানুষ কী শুনতে চায়, কী বলতে চায়। সমাজসেবার ছবিতে ভরে যায় পাতার পর পাতা, সমাজ এগোয় না। মানুষের পেটে খিদে থাকলে সমাজ এগোনোর কথা না। শুধু দানে সমাজ এগোয় না মোটেই। ছেঁড়া কাপড় পড়েই দানের কাপড় নিতে আসার ছবি বদলায় না। বেঁচে আছি কিনা নিজের গায়ে চিমটি কেটে দেখতে হয়। শবের মিছিল চারদিকে।

শবের মিছিল দিশাহীন। কেউ কারুর লেখা পড়ার সময় নেই, শুধুই কথা চালান্ একজনের থেকে আর একজনে। অমেরুদণ্ডীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে, যদিও বাইরে থেকে চেনার উপায় নেই। অমেরুদণ্ডীর দল হাবেভাবে নিজেকেও ঠকাচ্ছে, মানুষকেও। শিরদাড়া ছাড়াই দিব্বি বেঁচে আছে চারদিকে লাখে লাখে মানুষ। প্রশ্নহীন আনুগত্যের প্রদর্শনী বেড়েই চলেছে। বিষয়হীন বক্তৃতা বেড়েই চলেছে। কেউ শুনছে কিনা সেটাও কেউ খেয়াল রাখার নেই।

কেউ চেনে না কাউকে। খেলা চলছে সব সময়। যদিও কে জিতছে কে হারছে সেই নিয়ে মাথাব্যথা নেই । তবু খেলা থামানোর লোকদের দেখা নেই। ছেলেবেলায় দেখা পুতুলনাচ প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে, যদিও 'জ্যান্ত পুতুল নাচ' বেড়েই চলেছে। ভালোবাসা নেই, আস্থা নেই একফোঁটা, তবুও ক্ষমতার সামনে আত্মসমর্পণ করায় দ্বিধা নেই। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথায় "মিথ্যা যখন সত্যকে কান ধ'রে/ বেঞ্চের ওপর দাঁড়াতে বলে,/ আমরা সবাই গাধার টুপি মাথায়/ দৃশ্যটা উপভোগ করি"। নিজেকে সুরক্ষিত রাখাই মোক্ষ, অন্যের সম্মান, লাঞ্ছনা, অপমান নিয়ে ভাবার সময় কোথায় ! চায়ের টেবিলে, ট্রেনের কামরায় বিপ্লবী সাজাই যথেষ্ট, মাঠে নেমে পরিবর্তন করার লোক কমে গেছে।

পরিবর্তন এলেই ভোগ করবে যারা, তাদের অনেকেই খেলায় থাকে না কোন কালেই। খেলে, হারে, জেতে, মরে সব ঐ নির্বোধেরাই। পরিবর্তন এলেই নির্বোধেরা অধিকাংশই পিছিয়ে যায়, চেয়ারের চারদিকে ভিড় করে তারাই যারা গ্যালারিতে বসে খেলা দেখে পরিবর্তনের লড়াইয়ের সময়। এই ভাবেই চলে সময়, প্রশ্নটা হলো এভাবেই চলবে কিনা আর। এই ছন্দ চলেছে অতীতে, ভবিষ্যতে চলবে কিনা সেটা মানুষকেই ঠিক করতে হবে। জীবন যন্ত্রণায় কাতর মানুষের সময় কেটে যাচ্ছে দুবেলা দুমুঠো খাবার জোগাড়ে। তাদের ক্ষোভটাকে পুঞ্জীভূত করে সঠিক ঠিকানায় পৌঁছে দেবার উদ্যোগের অভাব আজও। মানুষের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা বাড়লেই ধ্বংসের পদধ্বনি শুনতে পান না কেউ, নিঃশব্দে সব হারিয়ে যায় অন্ধকারের ঠিকানায়। অতীতে এইভাবেই হারিয়ে গেছে, এখন আবার কালের গর্ভে হারিয়ে যাবে বর্তমান ক্ষমতার কেন্দ্র তা স্থির নিশ্চিত।

লেখক ঃ সহযোগী অধ্যাপক, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়।

—চারের পাতার পর

## বিজ্ঞান চেতনা প্রসার অভিযান

সংগঠনকে একত্রে নিয়ে 'সারা ভারত বিজ্ঞান চেতনা প্রসার অভিযান' এর কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ভারতের অন্যান্য অংশে এই কার্যক্রমের সূচনা হয়েছে নোবেলজয়ী দুই বিজ্ঞানী সি.ভি রমন ও মাদাম কুরীর জন্মদিন, ৭ নভেম্বর থেকে, চলবে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, জাতীয় বিজ্ঞান দিবস পর্যন্ত। জীবন ও জীবিকার জন্য বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ ও মুক্তচিন্তার প্রসার এবং জল জমি বন ও বিদ্যুতের দাবিতে সারা পশ্চিমবাংলা জুড়ে আগামী জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে মোট পাঁচটি সাইকেল র‍্যালি ও পদযাত্রা, সাংস্কৃতিক ও যুক্তিবাদী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রতিটি জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিজ্ঞানের বার্তা পৌঁছে দেবে।

কোচবিহার ও মালদা থেকে শুরু হয়ে দুটি র‍্যালি শিলিগুড়িতে গিয়ে শেষ হবে ২৩ জানুয়ারি ২০২৪। আবার পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ থেকে শুরু হয়ে তিনটি র‍্যালি কোলকাতায় সম্মিলিত হবে ২৮ জানুয়ারি ২০২৪। সেই সঙ্গে সারা রাজ্যে সংগঠনের প্রতিটি বিজ্ঞান কেন্দ্রেবিজ্ঞান উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এই উৎসবে সাংস্কৃতিক কর্মসূচির সাথে বিজ্ঞান প্রদর্শনী, পোস্টার প্রদর্শনী, স্লাইড বক্তৃতা, বিজ্ঞানের ক্যালেন্ডার প্রচার, পুস্তিকার প্রচার, অলৌকিকতার বিরুদ্ধে অনুষ্ঠান, রাতের আকাশ দেখা, কৃষিমেলা, শিশুবিজ্ঞান উৎসব, রান্নাঘরে বিজ্ঞান, সুসজ্জিত পদযাত্রা প্রভৃতির মাধ্যমে এলাকার সমস্ত অংশের মানুষকে সামিল করা হবে। এই নিবিড় প্রচার অনুষ্ঠানে যুক্তিবাদ ও মুক্তচিন্তার প্রসারের কথা যেমন তুলে ধরা হবে, তেমনই তুলে ধরা হবে মানুষের জীবন ও জীবিকার কথা। তুলে ধরা হবে জল, জমি, বন ও বিদ্যুতের অধিকারের কথা। আপনাদের সকলের সুচু অংশগ্রহণে এই অনুষ্ঠানগুলি প্রাণবন্ত হয়ে উঠুক।

# পারাজে সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির শিবির ও ডেপুটেশন

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৫ ডিসেম্বর** : সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি পূর্ব বর্ধমান জেলায় মনরেগার উপরে কাজ করছে। ১৩ ডিসেম্বর ১০৩টি ফর্ম ফিলআপ হয়েছে। এদিন গলসির পারাজে মনরেগার উপরে একটি শিবির সংগঠিত হয় সংগঠনের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যা জয়শ্রী বিষ্ণুর উদ্যোগে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদিকা সুপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় ও জেলা সভাপতি মণিমালা দাস সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। প্রায় ৮০ জন মহিলা উপস্থিত ছিলেন এই শিবিরে। শিবির শেষে বিডিওর কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। মহিলাদের দাবি ছিল, ১০০ দিনের কাজ দিতে হবে, বকেয়া মজুরি দিতে হবে, সব গরিব মানুষকে জবকার্ড দিতে হবে। সেই সঙ্গে আবাস যোজনায় সব গরিব মানুষকে ঘর দিতে হবে।

# সংগঠকদের স্মরণে রক্তদান

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৭ ডিসেম্বর** : সিপিআই(এম) পার্টির সংগঠকদের স্মরণে ছোট বহরকুলি গ্রামে অনুষ্ঠিত হয় রক্তদান শিবির। তিনজন যুবতীসহ ৩৭ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের কালনা-২ আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে প্রয়াত সমর মুখার্জী, কানাইলাল ব্যানার্জি, দীপক ব্যানার্জি স্মরণে এই রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। কালনা-২ ব্লকে সিপিআই(এম) পার্টি গড়ার ক্ষেত্রে এই তিন সংগঠক সমর মুখার্জী, কানাইলাল ব্যানার্জী এবং দীপক ব্যানার্জী বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

# মেমারি পৌরসভা অভিযানের প্রস্তুতি

**নিজস্ব সংবাদদাতা** : আগামী ২১ ডিসেম্বর মেমারি পৌরসভার বিভিন্ন দুর্নীতির প্রতিবাদে পৌরসভা অভিযান হবে এই উপলক্ষ্যে শনিবার পদযাত্রা হয়। সিপিআই(এম) মেমারি-১ পশ্চিম এরিয়া কমিটির উদ্যোগে এদিন বিকেল ৩টে নাগাদ মেমারি পৌরসভার ১ থেকে ৬ টি ওয়ার্ডকে নিয়ে ৫ নং ওয়ার্ড মাঠ পাড়া কালী মন্দিরের সামনে জমায়েত হয়।

# সাতগাছিয়া গ্রামে আসছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক

**বিদ্যুৎ ভৌমিক** : ক্রিকেট অনুরাগী মানুষদের অবাক করে দিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রাক্তন প্রবাদপ্রতিম অধিনায়ক ক্লাইভ লয়েড পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্ব সাতগাছিয়া গ্রামে আসতে চলেছেন। এবার সাতগাছিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে তাঁর আগমন। চারিদিকে ত্রাহি ত্রাহি রব পড়ে গেছে। আগামী ২০২৪ সালের ১২ জানুয়ারি তারিখে স্বামী বিবেকানন্দের শুভ জন্মদিনকে সার্থক ও স্মরণীয় করার প্রয়াসে পূর্ব সাতগাছিয়া গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই পরম আবেগে কর্মমুখর, দুবারের বিশ্বকাপ জয়ী ৮৩ বছর বয়সী লয়েডকে উষ্ণ অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন জানাতে। বিস্ময়ের অন্ত নেই।

সূত্র মারফৎ জানা যায় যে, অধিনায়ক ক্লাইভ লয়েড বিশ্বকাপ ক্রিকেটে ৩ বারের ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দলের অধিনায়ক পদে আসীন ছিলেন। তার মধ্যে ১৯৭৫ ও ১৯৭৯ সালে চ্যাম্পিয়ন শিরোপায় ভূষিত হয়ে বিশ্বকাপের ট্রফি ঘরে তুলেছিলেন। কিন্তু ১৯৮৩ সালে ভারতের কাছে পরাজয় স্বীকার করে মাঠ ছেড়েছিলেন।

ভাবলে অবাক হতে হয় যে, সুদূর গায়ানা থেকে কলকাতা শহরে পা রেখে পূর্ব বর্ধমান জেলার অজ গাঁয়ে যাবেন যেখানে গাছগাছালিতে ঘেরা সবুজ বনানী। এমনও খবর আছে সাতগাছিয়া সংহতি ক্লাবের ৮ দলের আমন্ত্রণমূলক ক্রিকেট প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় তিনি বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করবেন। কটি কাঁচা খুদে ক্রিকেটারদের সঙ্গে সময় কাটাতে সর্বোপরি ক্রিকেটে তাদের প্রেরণা জোগাতে তিনি অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করে ক্রিকেট দুনিয়ায় ফিরে যাবেন। কলকাতার ইডেন গার্ডেন তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ও একান্ত আপন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, দুবারের বিশ্বকাপের ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দলের কিংবদন্তি অধিনায়ক ক্লাইভ লয়েড এখনও ফুরিয়ে যাননি।

# পাখি-চোখ-৫৬

**রত্না রশীদ**

ক্রিকেট নিয়ে দুটো সমভাষী দেশবাসীর সেই যে কেমন লাগলো, খেলা শেষ হয়ে যে যার বাড়ি পৌঁছে গিয়ে অন্যান্য খেলায় জয়ী বিজয়ী তিলক লাগিয়ে ফেললো, অথচ কুয়োর ব্যাঙেদের গ্যাঙর গ্যাঙ্ আর থামে না। যে যাকে যেমন পারছে ইট পাটকেল ছুঁড়ে মারছে। এপারের চেয়ে ওপারে কটূ কাটব্য কম না বেশি, সে নিয়েও জনগণ নিজেদের মধ্যে বিচার-কমিশন বসাচ্ছে। আদত ব্যাপারটা ঝগড়া হলেও কী চমৎকার সব হাস্যরস সমন্বিত চটি-নাটিকার জন্ম ঘটেই চলেছে অনবরত। এর একটা লিখিত ডকুমেন্ট থাকবে না? এ্যাঁ---এ যে আমাদের সনাতনী বাঙাল-ঘটির কিস্‌সা!

খেলা যেখানে যা হয়েছে, হয়ে গেছে। সব্বাই খুব যে ক্রিকেট বোদ্ধা তা নয়, তবে ওই যে কথায় আছে না---ফুট কাটানি। এটা বাঙাল-ঘটি দুটোরই বৈশিষ্ট্য। নন মেডিক্যাল পার্সন যদিও তবুও বাতলাবে, চিকিৎসায় ভুল হয়েছে। ডাক্তারটা 'ইঞ্জিশন' ফুটিয়ে দিতে রুগিটা মরি গেলো। অথবা, —ওই মাস্টারটো অতো কড়া বলি ছেলেপুলেগুলো অর কাছ ঘেঁষে না—আর তাতেই সব ফেল মেরি গেলো। এবম্বিধ শত হাজার বিশেষভাবে-অজ্ঞ বিশেষজ্ঞ ঘটি বাঙাল বাটি বাঘ আমরা সবাই। খেলা মাঠে শেষ হয়ে গেছে কবেই, শেষ হবার নয় আমাদের এই ছছুন্দরী ঝগড়া—

—ক্যাশ্ করসি ঈদ মানাইছি, বারোত হারলে মনডা আনন্দে আকাশ ছোঁয়।

—তাতো বলবিই, ভারত না পাশ দাঁড়ালে 'বাংলাদেশ' কেউ খুঁজে পেতো না, পাকিস্তানীই রয়ে যেতিস।

—বারোতেরও ইন্টারেস্ট আছিলো, এ্যামনে না।

—সে তো বলবিই তোরা। যে পাতে খাস্ সে পাতে আগে ফুটো করিস।

—বারোতের বিরুদ্ধে কলাগাছেরেও সাপোর্ট করুম, বারোতরে না।

—তবে যা কলাগাছে পেঁয়াজ ফলা, লঙ্কা ফলা, ডাক্তার পেড়ে আন্।

—পদ্মা দিয়া হিহানে মন সিহানে যামু, তগো কি?

—আমরা বর্ষাকালে ফারাক্কার জল ছেড়ে দেবো, গ্রীষ্মকালে জল বেঁধে রাখবো। কলাগাছের থেকে জল নিবি।

এই ঝগড়া এরপর আর কলমে আনার যোগ্য থাকে না। এই দুপক্ষের কেউ জেনেও মানে না যে বৃহত্তর ভারতের কেউই এই সংলাপ না পারবে পড়তে, না বুঝতে, না কোন রকম প্রতিক্রিয়া দিতে পারবে। এ কেবলই মাত্র একই বাংলাভাষী লোকজনের পারস্পরিক ডায়লগ। এতে ভারত কোনো 'পক্ষ'ই নয়। ভারত এক বহু ভাষাভাষী, বহু ধর্মাবলম্বী, বহু খাদ্যাভাষী এক বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ। বহু সামর্থ্য, অনেক অসামর্থ্য নিয়ে পরিপূর্ণ এই দেশ কোনো কারণেই বাংলাদেশকে অবন্ধু ভাবতে পারে না। পারবেও না কোনোদিন। এই বাঙাল-ঘটি-হিন্দু-মুসলিমের পূর্বোল্লেখিত ডায়লগ নির্ভর মানসিকতা ও ভারতবর্ষের হবারই নয়। হবেও না কোনোদিন। আর পাশের বাড়ির বাংলাদেশকে কোনো কারণেই পর ভাবতে আমরা পারবো না। এমন অন্তরের কাছাকাছি আপন প্রতিবেশী সত্যিই আমাদের কেউ নেই। বাড়ির চৌকাঠ পেরোলেই বাংলাদেশ। সে দেশ আরো আরো সুজলা সুফলা হয়ে বেড়ে উঠুক, স্বয়ংসম্বর হয়ে মাথা তুলে দাঁড়াক এটা সব ভারতীয়ের প্রার্থনা। ঝগড়া নয়, কোনোরকম মন কষাকষিও নয়, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ভালোবাসা আপনতা নিয়ে পাশাপাশি প্রতিবেশী আনন্দে বসবাস করি আমরা। দেশের কূটনীতি, অর্থনীতি, বিদেশনীতি আমাদের মতো সাধারণ মানুষের হৃদয় যেন টলিয়ে দিতে না পারে। সব কিছুর ওপরে থাক দুই দেশের সৌভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা। এর চেয়ে বড়ো কিছু নেই।

(চলবে)

## সাধারণ গ্রন্থাগার বাঁচান

—তিনের পাতার পর

সংগঠন-সংগঠন, আন্দোলন-আন্দোলন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি তো আছেই, আছে অন্যান্য গ্রন্থাগার সংগঠন, কিন্তু তা যথেষ্ট হচ্ছে না, চাই আরও সমভাবসম্পন্ন সংগঠন--শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, সাক্ষরতা, পাইওনিয়ার ইত্যাদি। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে পরিণত করতে হবে সামগ্রিক গণ আন্দোলনে। সরকার যেখানে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ধ্বংসের অভিযানে নেমেছে, সেখানে প্রতিরোধ তো সমাজের সর্বস্তরের মানুষই করতে পারেন, আর সেই ঐক্যই গড়ে তুলতে হবে।


শিবানন্দ পাল প্রণীত 'বিপ্লবী হরেকৃষ্ণ কোঙার' গ্রন্থটি পাওয়া যাচ্ছে---ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ-এর সমস্ত বিপণীতে। এছাড়াও 'নতুন চিঠি' পত্রিকা দপ্তর, ৬২ বি সি রোড, অনিতা সিনেমা লেন, বর্ধমানে। মূল্য—৩০০ টাকা।





# কালনা বইমেলা শুরু

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৬ ডিসেম্বর** : তৃতীয় বর্ষের কালনা বইমেলা শুরু হবে রবিবার থেকে। বিভিন্ন সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে চলবে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত। কালনার শিক্ষক, ছাত্র-যুব এবং বিশিষ্ট নাগরিকদের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই মেলা উপলক্ষ্যে শনিবার বর্ণাঢ্য মিছিল হয়। এই মিছিলে হাঁটেন ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বইপ্রেমী মানুষজন। সাধারণ মানুষকে এই মেলা সফল করার আহ্বান জানানো হয়।

## খেজুর গুড়ের স্বাদ

—তিনের পাতার পর

গলার বাকল চেঁছে শূন্য হাঁড়ি ঝুলিয়ে দেন। যা সন্ধ্যা অবধি চলতে থাকে। আবার পূর্ণ রসের হাঁড়ি কাকডাকা ভোর হতে নামানো শুরু হয়। রস সংগ্রহের জন্য হাঁড়িসমূহ সাধারণত মাটির তৈরি হয়ে থাকে। এসব হাঁড়ি হতে রস সংগ্রহের পর এগুলো প্রতিদিন ধুয়ে পরিষ্কার করে রৌদ্রে শুকাতে হয় যাতে পোকা বা ছত্রাকের আক্রমণ না হতে পারে। প্রথম কাট-এর রস দিয়ে হয় এক নম্বর গুড়, দ্বিতীয় কাট দিয়ে হয় দু'নম্বর গুড়। আউশ গ্রাম ব্লকের অভিরামপুর, গুড় মহলের মালিক ও শিউলি সেলিম মণ্ডল জানালেন চার দিন অন্তর একটি গাছকে বাঁধা হয়। তারপর তিনদিন পর রোদ খাইয়ে আবার দ্বিতীয় কাটার রস নামে। এই সেন্টারে প্রতিদিন এক কুইন্টাল গুড় নামে। প্রকৃতি আমাদেরকে সাথ দিলে আমাদের কপাল ফেরে। এই রকম শীত ধারাবাহিক চললে ভালো গুড়ের সরবরাহ বজায় থাকবে। তিনি আরও জানান খেজুর গুড়ের চাহিদা যা। পশ্চিম বাংলায় সে পরিমাণ খেজুর গাছ নেই। তার ওপর প্রকৃতি সহায় থাকে না। এর ফলেই খেজুর গুড়ের স্বাদ হারিয়ে ভেজাল গুড়ের পাল্লায় পড়ছে বাঙালি।

## ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সর্বনাশ

—তিনের পাতার পর

ভিত্তিকে পরিকল্পিতভাবে দুর্বল করা হচ্ছে। সরকারি ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার বিপর্যয়ের অর্থ অর্থনীতির বিপর্যয়। এটা শুধুমাত্র ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত কর্মীদের বিপদ ও সমস্যা নয়, এটা সামগ্রিকভাবে জনসাধারণের বড় বিপদ। 'সরকারি ব্যাঙ্ক বাঁচাও' তাই প্রায় 'দেশ বাঁচাও'-এর সমার্থক। সরকারি ব্যাঙ্ক বাঁচানো ও তাকে সবল করার প্রচেষ্টায় সকল মানুষের অংশগ্রহণ জরুরি।

## দাবি ইনসাফ যাত্রায়

—তিনের পাতার পর

মতোই ইনসাফ পাচ্ছে না। কালনা মহাকুমা কৃষি নিবিড় মহকুমাও বটে। কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসলের দাম পাচ্ছেন না বলেই সারা রাজ্যের সাথে এখানেও কৃষকের আত্মহত্যা দিন দিন বাড়ছে। তিনি আরো বলেন এই এলাকার বিধায়ক তথা মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ এদের জন্য কিছুই করছেন না। তাই আত্মহত্যার সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। কৃষক বা তাঁতশিল্পী যিনিই আত্মহত্যা করুন না কেন, সরকারিভাবে বলে দেওয়া হচ্ছে পারিবারিক কলহের জেরেই এরা আত্মঘাতী হয়েছেন। এই বেইনসাফী কথার বিরুদ্ধেই আমাদের এই ইনসাফ যাত্রা। আর এই ইনসাফ যাত্রায় দেখা গেল পুলিশ টিয়ার গ্যাস, বন্দুক, লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেখে মনে হচ্ছে পুলিশ কোন সন্ত্রাসবাদ অভিযান চালাচ্ছে। বেকারদের কাজের দাবিতে এই সামান্য ইনসাফ যাত্রাও ওদের সহ্য হচ্ছে না। যত ভয় দেখাক না কেন এই ইনসাফ যাত্রা চলবে। যাত্রার শেষে ৭ জানুয়ারি ব্রিগেডে সমাবেশও অনুষ্ঠিত হবে। এদিন এই ইনসাফ যাত্রায় পা মেলান মহিলা নেত্রী অঞ্জু কর, সাখাওয়াত হোসেন, সুকুল শিকদার, আলিম শেখ, তাপস চ্যাটার্জি, সাহাদুল খান প্রমুখ।

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu)

E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক


সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ ঝা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন : ৯৪৩৪২৫১৫৮৬। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪। মূল্য : ২ টাকা